
এডগার অ্যালান পো
দ্য ফল অফ দ্য
হাউস অফ আশার
ক্যাটালগ
catalog.com.bd

ফল অফ দ্য হাউস অফ আশার

(আশারদের বাড়ির পতন)

এডগার অ্যালান পো

দ্য ফল অফ দ্য হাউস অফ আশার এডগার অ্যালান পো–র অন্যতম বিখ্যাত গথিক হরর ছোটগল্প। এক পুরোনো, রহস্যময় প্রাসাদে অসুস্থ ও অদ্ভুত স্বভাবের রডরিক আশারের আমন্ত্রণে তার এক পুরোনো বন্ধু এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু আশার পরিবারের ইতিহাস, প্রাসাদের অস্বাভাবিক পরিবেশ এবং একের পর এক রহস্যময় ঘটনা তাকে এমন এক আতঙ্কের মুখোমুখি করে, যার পরিণতি হয়ে ওঠে ভয়াবহ।

ক্যাটালগ
catalog.com.bd

অনুবাদ ● এস হক
প্রচ্ছদ ● ক্যাটালগ
সহযোগিতায় ● আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স

www.catalog.com.bd
info@catalog.com.bd

কপিরাইট © Catalog.com.bd

ইংরেজি মূল রচনাটি পাবলিক ডোমেইনভুক্ত। এই সংস্করণের বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা ও বিন্যাস Catalog.com.bd –এর স্বতন্ত্র সৃজনশীল কাজ। Catalog.com.bd –এর অনুমতি ব্যতীত এই বাংলা অনুবাদ বা এর বিন্যাসকৃত সংস্করণের অনুলিপি, পুনঃপ্রকাশ বা বাণিজ্যিক ব্যবহার অনুমোদিত নয়।

“তার হৃদয় যেন ঝুলন্ত এক বীণা;
ছোঁয়া মাত্রই যার তার বেজে ওঠে।”

– দ্য বেরাঞ্জার

এক শরতের বিষণ্ন, অন্ধকার ও নিস্তব্ধ দিনে–যেদিন মেঘগুলো আকাশের ওপর অত্যন্ত নিচু হয়ে ঝুলছিল–আমি একা ঘোড়ায় চড়ে এক অদ্ভুত নির্জন ও বিষণ্ন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসার সময় অবশেষে আমার চোখে পড়ল সেই বিষণ্ন আশার প্রাসাদ।

জানি না কীভাবে–কিন্তু ভবনটির প্রথম দর্শনেই এক অসহনীয় বিষণ্নতা আমার মনে ছড়িয়ে পড়ল। আমি একে অসহনীয় বলছি, কারণ এর মধ্যে সেই অদ্ভুত, অর্ধেক আনন্দময় অথচ কাব্যিক অনুভূতিটুকুও ছিল না, যা সাধারণত কোনো নির্জন বা ভয়ংকর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলে মনের মধ্যে জেগে ওঠে। আমি তাকালাম সামনের দৃশ্যের দিকে–শুধু বাড়িটির দিকে, জমিদারির সাধারণ ভূদৃশ্যের দিকে, বিবর্ণ দেয়াল, শূন্য চোখের মতো জানালা, কয়েকটি আগাছায় ভরা নলখাগড়া এবং পচে যাওয়া

গাছের কয়েকটি সাদা কাণ্ডের দিকে। আমার আত্মা এমন এক গভীর হতাশায় ডুবে গেল, যার সঙ্গে পৃথিবীর আর কোনো অনুভূতির তুলনা করতে পারি না—শুধু আফিমাসক্ত মানুষের নেশা কাটার পরের সেই তিক্ত বাস্তবতায় ফিরে আসার মুহূর্তের সঙ্গে তুলনা করা যায়; যেন ভয়ংকর কোনো পর্দা হঠাৎ সরে গেছে।

হৃদয়ে যেন বরফের শীতলতা, এক অদ্ভুত নিমজ্জনের অনুভূতি, অসুস্থ করে দেওয়া ভয়; আর চিন্তার এমন এক নিরানন্দ শূন্যতা, যাকে কল্পনার কোনো উত্তেজনাই মহিমান্বিত করে তুলতে পারছিল না। কী এমন ছিল—আমি থেমে ভাবলাম—আশার বাড়িটিকে দেখলেই কেন আমার এত অস্বস্তি হচ্ছিল? রহস্যটির কোনো সমাধানই আমি খুঁজে পেলাম না। মাথার মধ্যে ভিড় করা অস্পষ্ট কল্পনাগুলোর সঙ্গেও লড়তে পারছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত আমাকে এই অসন্তোষজনক সিদ্ধান্তেই ফিরে আসতে হলো যে, অত্যন্ত সাধারণ কিছু প্রাকৃতিক বস্তুর নির্দিষ্ট বিন্যাসও মানুষের মনে এমন গভীর প্রভাব ফেলতে পারে; কিন্তু সেই প্রভাবের প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণ করা

হয়তো আমাদের বোধের সীমার বাইরে। আমার মনে হলো, দৃশ্যটির সামান্য ভিন্ন বিন্যাস–ছবিটির উপাদানগুলোর সামান্য পরিবর্তন–হয়তো তার বিষণ্নতা সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে কমিয়ে দিতে পারে, এমনকি সম্পূর্ণ ধ্বংসও করতে পারে।

এই চিন্তা থেকে আমি ঘোড়ার লাগাম টেনে বাড়িটির পাশে থাকা কালো, বিষণ্ন এক জলাশয়ের খাড়া কিনারায় নিয়ে গেলাম। শান্ত, অন্ধকার জলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানে নলখাগড়া, মৃত গাছের কঙ্কাল আর শূন্য চোখের মতো জানালাগুলোর উল্টো প্রতিচ্ছবি। কিন্তু সেই দৃশ্য আমাকে আগের চেয়েও বেশি শিহরিত করল।

তবু এই অন্ধকার প্রাসাদেই আমি কয়েক সপ্তাহ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এর মালিক রডরিক আশার ছোটবেলায় আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। কিন্তু আমাদের শেষ দেখা হওয়ার পর বহু বছর কেটে গেছে। কিছুদিন আগে দেশের এক দূরবর্তী অঞ্চলে থাকাকালে তার কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলাম। চিঠিটির ভাষা এতটাই ব্যাকুল ছিল যে ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

হাতের লেখায় স্পষ্ট ছিল গভীর মানসিক অস্থিরতা। সে নিজের তীব্র শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক যন্ত্রণা এবং আমাকে দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছিল। আমি ছিলাম তার সবচেয়ে কাছের–এমনকি সম্ভবত একমাত্র–ব্যক্তিগত বন্ধু। সে আশা করেছিল, আমার সঙ্গের আনন্দ হয়তো তার অসুস্থতা কিছুটা লাঘব করবে। তার অনুরোধের ভাষা, আর তার পেছনে থাকা আন্তরিকতা আমাকে এক মুহূর্তও দ্বিধা করতে দিল না। তাই সেই অদ্ভুত আহ্বানে আমি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলাম।

ছোটবেলায় আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও আমার বন্ধুটিকে আমি আসলে খুব বেশি চিনতাম না। তার স্বভাবগত গোপনীয়তা সবসময়ই ছিল অত্যন্ত প্রবল। তবে জানতাম, তার বহু প্রাচীন পরিবারটি যুগের পর যুগ ধরে অদ্ভুত সংবেদনশীল মনের জন্য পরিচিত ছিল। এই বংশের মানুষরা অসাধারণ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছিল, নিঃশব্দে বিপুল দান করেছিল এবং সঙ্গীতের প্রচলিত সৌন্দর্যের চেয়েও তার জটিল ও দুর্বোধ্য দিকের প্রতি গভীর অনুরাগ দেখিয়েছিল।

আরও একটি অদ্ভুত বিষয় আমি জানতাম– আশার বংশে কোনো সময়ই দীর্ঘস্থায়ী পার্শ্বশাখা তৈরি হয়নি। অর্থাৎ পুরো পরিবারটি প্রায় সরাসরি পিতা থেকে পুত্রের ধারায় এগিয়েছে। কয়েক শতাব্দী ধরে এই একই রক্তধারা ও একই সম্পত্তি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে গেছে। সম্ভবত এ কারণেই পরিবার ও বাড়িটি এতটাই একে অপরের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল যে জমিদারির পুরোনো নামের বদলে লোকজন পুরো পরিবার ও প্রাসাদকেই একসঙ্গে "আশারদের বাড়ি" নামে ডাকত।

জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে করা আমার সেই শিশুসুলভ পরীক্ষাটি প্রথম অনুভূতিকে আরও তীব্র করেছিল। আমার কুসংস্কার বাড়ছে–এই উপলব্ধিই যেন কুসংস্কারকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল। ভয় থেকে জন্ম নেওয়া সব অনুভূতির এ এক অদ্ভুত নিয়ম।

আবার যখন জলাশয়ের প্রতিচ্ছবি থেকে চোখ তুলে মূল বাড়িটির দিকে তাকালাম, আমার মনে এমন এক অদ্ভুত কল্পনা জন্ম নিল যে সেটি বলা প্রায় হাস্যকর। মনে হলো পুরো বাড়ি ও জমিদারির চারপাশে যেন নিজস্ব এক পরিবেশ

তৈরি হয়েছে–আকাশের বাতাসের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। পচা গাছ, ধূসর দেয়াল ও নিস্তব্ধ জলাশয় থেকে যেন উঠে আসছে এক বিষাক্ত, রহস্যময় বাষ্প–ধীর, ভারী, অস্পষ্ট এবং সীসার মতো রঙের।

নিজেকে বোঝালাম, নিশ্চয়ই এটা কেবল স্বপ্নের মতো কল্পনা। তারপর বাড়িটিকে আরও ভালো করে দেখলাম। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তার ভয়ংকর প্রাচীনত্ব। যুগের পর যুগের বিবর্ণতা তার ওপর জমে ছিল। সূক্ষ্ম ছত্রাক পুরো বাইরের দেয়াল ঢেকে ফেলেছিল এবং কার্নিশ থেকে সূক্ষ্ম জালের মতো ঝুলে ছিল।

তবু বাড়িটি পুরোপুরি ভেঙে পড়েনি। আশ্চর্যের বিষয় ছিল–পুরো স্থাপনাটি এখনও নিখুঁতভাবে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ পৃথক পাথরগুলো যেন ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। বহু বছর ধরে কোনো বাতাস না পাওয়া পুরোনো কাঠের গুদামে পচে যাওয়া কাঠের যে অদ্ভুত সামগ্রিক চেহারা দেখা যায়, তার কথা মনে পড়ল। বাড়িটির অস্থিতিশীলতার খুব বেশি চিহ্ন চোখে পড়ছিল না। তবে ভালো করে তাকালে ছাদের কাছ থেকে

একটি সূক্ষ্ম ফাটল দেখা যেত, যা আঁকাবাঁকা পথে দেয়াল বেয়ে নিচে নেমে শেষ পর্যন্ত জলাশয়ের অন্ধকার জলে হারিয়ে গেছে।

আমি একটি ছোট সেতু পেরিয়ে বাড়ির কাছে পৌঁছালাম। একজন চাকর আমার ঘোড়াটি নিয়ে নিল। আমি গথিক খিলানের নিচ দিয়ে প্রবেশ করলাম। নীরব পায়ে চলা এক পরিচারক আমাকে অন্ধকার ও জটিল অনেকগুলো করিডর পেরিয়ে তার মালিকের স্টুডিওতে নিয়ে গেল।

পথে দেখা সবকিছুই আমার আগের অস্বস্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল। ছাদের খোদাই, দেয়ালের বিষণ্ন ট্যাপেস্ট্রি, আবলুস কাঠের মতো কালো মেঝে এবং আমি হাঁটলে শব্দ করা অদ্ভুত বংশীয় প্রতীক—এসব আমার শৈশব থেকেই পরিচিত। তবু সাধারণ জিনিসগুলো আমার মনে যে অস্বাভাবিক কল্পনা জাগাচ্ছিল, তা আমাকে বিস্মিত করছিল।

একটি সিঁড়িতে পরিবারের চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা হলো। তার মুখে যেন নিম্নচালাকি ও বিভ্রান্তির মিশ্র ছাপ। সে ভীতস্বরে আমাকে

সম্ভাষণ করে চলে গেল। পরিচারক একটি দরজা খুলে আমাকে তার মালিকের সামনে নিয়ে গেল।

ঘরটি ছিল বিশাল ও অত্যন্ত উঁচু। জানালাগুলো লম্বা, সরু ও সূচালো; এত উঁচুতে ছিল যে ভেতর থেকে সেগুলোতে পৌঁছানো অসম্ভব। জালির মতো কাচ দিয়ে দুর্বল লালচে আলো ঢুকছিল। ঘরের বড় বড় জিনিসগুলো দেখা গেলেও দূরের কোণগুলো এবং খিলান-খচিত ছাদের গভীর অংশ চোখে ধরা পড়ছিল না।

দেয়ালে ঝুলছিল অন্ধকার কাপড়। আসবাব ছিল প্রচুর, কিন্তু অস্বস্তিকর, প্রাচীন ও ছেঁড়া। চারদিকে বই ও বাদ্যযন্ত্র ছড়িয়ে ছিল, তবু সেগুলো ঘরে কোনো প্রাণের অনুভূতি আনতে পারেনি। মনে হচ্ছিল আমি যেন দুঃখের বাতাসে শ্বাস নিচ্ছি। এক কঠোর, গভীর ও মুক্তিরহিত বিষণ্নতা পুরো ঘরটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

আমি ঢুকতেই আশার সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল এবং অত্যন্ত প্রাণবন্ত উষ্ণতায় আমাকে অভ্যর্থনা করল। প্রথমে মনে হয়েছিল তার সৌজন্য যেন কিছুটা অভিনয় করা। কিন্তু তার মুখের দিকে

তাকিয়ে বুঝলাম সে সত্যিই আমাকে দেখে আনন্দিত।

আমরা বসলাম। কিছুক্ষণ সে কথা বলল না। আমি তাকে দেখে একই সঙ্গে করুণা ও ভয় অনুভব করছিলাম। এত অল্প সময়ে কোনো মানুষকে এত ভয়ংকরভাবে বদলে যেতে আমি কখনও দেখিনি। ছোটবেলার সেই বন্ধুটির সঙ্গে সামনে বসা মানুষটিকে মেলানো কঠিন হয়ে উঠেছিল।

তার চেহারা আগেও অস্বাভাবিক ছিল—মৃতের মতো ফ্যাকাশে মুখ, বিশাল ও উজ্জ্বল চোখ, পাতলা ও বিবর্ণ ঠোঁট, সূক্ষ্ম নাক, দুর্বল চিবুক এবং মাকড়সার জালের মতো নরম চুল। এখন সেই বৈশিষ্ট্যগুলো অতিরঞ্জিত হয়ে এমন রূপ নিয়েছে যে তাকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত করাই কঠিন। তার ত্বক ছিল ভয়ংকর ফ্যাকাশে, চোখে ছিল অস্বাভাবিক দীপ্তি, আর লম্বা নরম চুল মুখের চারপাশে এমনভাবে ভাসছিল যেন মানুষের নয়, কোনো অদ্ভুত চিত্রের অংশ।

তার আচরণেও ছিল অসংলগ্নতা। কখনও অত্যন্ত প্রাণবন্ত, আবার মুহূর্তেই বিষণ্ন। কণ্ঠস্বর

কখনও কাঁপা ও দ্বিধাগ্রস্ত, আবার কখনও হঠাৎ ভারী, সংক্ষিপ্ত ও অস্বাভাবিক দৃঢ়।

সে তার অসুস্থতার কথা বলতে শুরু করল। বলল, এটি তাদের পরিবারেরই এক ধরনের অভিশাপ। সে প্রায় নিশ্চিত ছিল যে এর কোনো চিকিৎসা নেই। তার ইন্দ্রিয়গুলো অস্বাভাবিকভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। সামান্য স্বাদের খাবার ছাড়া অন্য কিছু সহ্য করতে পারত না; নির্দিষ্ট ধরনের কাপড় ছাড়া অন্য পোশাক পরতে পারত না; ফুলের গন্ধও তার কাছে অসহনীয় ছিল; সামান্য আলো তার চোখে যন্ত্রণা সৃষ্টি করত। কেবল কিছু নির্দিষ্ট তারবাদ্যযন্ত্রের শব্দই তার কাছে সহনীয় ছিল।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ছিল তার ভয়।

“আমি ধ্বংস হয়ে যাব,” সে বলল। “আমাকে এই ভয়ংকর উন্মাদনা গ্রাস করবে। ভবিষ্যতের ঘটনাগুলোকে আমি ভয় পাই না; ভয় পাই তাদের ফলাফলকে। এমনকি সামান্য কোনো ঘটনা যদি আমার এই অসহনীয় মানসিক অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে দেয়, সেই চিন্তাতেই আমি কেঁপে উঠি। বিপদকে আমি ভয় পাই না; ভয় পাই তার

প্রভাবকে। এই অবস্থায় একদিন না একদিন আমাকে জীবন ও বুদ্ধি–দুটোকেই সেই ভয়ংকর আতঙ্কের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ছেড়ে দিতে হবে।”

তার মানসিক অবস্থার আরেকটি অদ্ভুত দিক ধীরে ধীরে জানতে পারলাম। সে তার বাড়ি সম্পর্কে নানা কুসংস্কারে বন্দী ছিল। বহু বছর ধরে সে বাড়ি থেকে বের হয়নি। তার বিশ্বাস ছিল, বাড়িটির গঠন, ধূসর দেয়াল, মিনার এবং সামনের অন্ধকার জলাশয় কোনো অদৃশ্য প্রভাবের মাধ্যমে তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

তবে সে স্বীকার করল, তার বিষণ্নতার সবচেয়ে বাস্তব কারণ ছিল তার একমাত্র প্রিয় বোনের দীর্ঘদিনের অসুস্থতা। ম্যাডেলিন ছিল তার শেষ জীবিত আত্মীয় এবং বহু বছর ধরে তার একমাত্র সঙ্গী। তার মৃত্যু হলে আশার বংশের শেষ মানুষটিও রডরিক নিজেই হবে।

সে কথা বলার সময় ঘরের দূরবর্তী অংশ দিয়ে এক নারী ধীরে ধীরে চলে গেলেন। তিনি ছিলেন ম্যাডেলিন। আমার উপস্থিতি তিনি লক্ষ্যই করলেন না। তার দিকে তাকিয়ে আমি অদ্ভুত

বিস্ময় ও ভয় অনুভব করলাম। তিনি চলে যাওয়ার পর আমি স্বভাবতই রডরিকের দিকে তাকালাম। সে মুখ দুই হাতে ঢেকে ফেলেছিল, আর তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

ম্যাডেলিনের রোগ বহুদিন ধরে চিকিৎসকদের বিভ্রান্ত করেছিল। তার মধ্যে ছিল গভীর উদাসীনতা, ধীরে ধীরে শরীর শুকিয়ে যাওয়া এবং মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে এমন এক ধরনের অবস্থা, যা প্রায় ক্যাটালেপ্সির মতো। এতদিন সে রোগের সঙ্গে লড়াই করে চলেছিল এবং পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়নি। কিন্তু আমার আসার সন্ধ্যাতেই সে হঠাৎ ভেঙে পড়ল। রডরিক জানাল, জীবিত অবস্থায় সম্ভবত এটাই তাকে দেখার আমার শেষ সুযোগ।

পরবর্তী কয়েকদিন আমরা কেউই ম্যাডেলিনের কথা বললাম না। আমি আমার বন্ধুর বিষণ্নতা দূর করার চেষ্টা করলাম। আমরা একসঙ্গে ছবি আঁকলাম, বই পড়লাম, অথবা আমি তার গিটারের অদ্ভুত তাৎক্ষণিক সুর শুনতাম। যত বেশি তার মনের গভীরে প্রবেশ করলাম, ততই বুঝলাম তাকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা প্রায় অর্থহীন। তার

মন থেকে যেন অন্ধকার এক অবিরাম বিকিরণের মতো চারপাশের সবকিছুকে ঢেকে ফেলছিল।

তার সঙ্গে কাটানো সেই দীর্ঘ ও গম্ভীর সময়গুলো আমি কখনও ভুলব না। সে আমাকে অদ্ভুত সব বই পড়াত, অস্বাভাবিক চিন্তার জগতে নিয়ে যেত, আর নিজে দীর্ঘ বিষণ্ন সুর বাজাত। তার আঁকা ছবিগুলোও ছিল অস্বাভাবিক। সামান্য কয়েকটি সরল রেখা দিয়ে সে এমন ধারণা তৈরি করত, যা আমার মধ্যে অসহনীয় আতঙ্ক সৃষ্টি করত।

একটি ছবিতে দেখা যেত মাটির অনেক গভীরে থাকা অতি দীর্ঘ ও আয়তাকার একটি সুড়ঙ্গ। দেয়াল ছিল নিচু, মসৃণ ও সাদা। কোথাও কোনো দরজা বা পথ ছিল না। কোনো মশাল বা আলো দেখা যাচ্ছিল না, অথচ অদ্ভুত এক তীব্র আলো পুরো সুড়ঙ্গকে আলোকিত করে রেখেছিল।

রডরিকের শ্রবণেন্দ্রিয় এতটাই সংবেদনশীল ছিল যে প্রায় সব ধরনের সঙ্গীত তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। কেবল গিটার তার সহ্য হতো। সে প্রায়ই তাৎক্ষণিকভাবে গান তৈরি করত– সুরের সঙ্গে নিজেই কবিতা বানাত।

এর মধ্যে একটি কবিতা আমার মনে গভীরভাবে গেঁথে আছে। এর নাম ছিল “ভূতুড়ে প্রাসাদ” ।

ভূতুড়ে প্রাসাদ

একটি সবুজতম উপত্যকার মাঝে,

যেখানে শুভ ফেরেশতারা বাস করত,

একদিন দাঁড়িয়ে ছিল এক সুন্দর, মহিমান্বিত প্রাসাদ–

দীপ্তিময় এক প্রাসাদ।

চিন্তার রাজ্যের কেন্দ্রে

সে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল!

কোনো দেবদূত তার ডানা মেলে

এত সুন্দর প্রাসাদের ওপর কখনও উড়েনি।

তার ছাদে উড়ত

সোনালি, হলুদ, মহিমান্বিত পতাকা;

সে ছিল বহু পুরোনো এক সময়ের স্মৃতি।

আর সেই সুখের দিনে

প্রাসাদের প্রাচীর ছুঁয়ে যাওয়া

প্রতিটি কোমল বাতাস

ডানা মেলে সুগন্ধ বহন করে নিয়ে যেত।

সেই সুখের উপত্যকার পথিকেরা

দুটি উজ্জ্বল জানালার ভেতর দিয়ে দেখত–

সুরেলা বীণার তালে

আত্মারা সঙ্গীতের মতো নাচছে।

একটি সিংহাসনের চারপাশে

তারা ঘুরে বেড়াত,

আর সেখানে বসে থাকত রাজ্যের শাসক,

নিজের গৌরবের উপযুক্ত মহিমায়।

মুক্তো ও রুবির আলোয় ঝলমল করত

সুন্দর প্রাসাদের দরজা।

সেই দরজা দিয়ে

অবিরাম বেরিয়ে আসত প্রতিধ্বনির দল,

যাদের একমাত্র কাজ ছিল

অসাধারণ সুন্দর কণ্ঠে

তাদের রাজার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার গান গাওয়া।

কিন্তু শোকের পোশাক পরা অশুভ শক্তি

আক্রমণ করল সেই রাজার রাজ্য।

হায়, আমাদের শোক করতে দাও,

কারণ তার জন্য আর কোনো আগামী সকাল আসবে না!

তার বাড়ির চারপাশে যে সৌন্দর্য

একদিন ফুটে উঠেছিল,

এখন তা কেবল বহু পুরোনো,

সমাধিস্থ সময়ের অস্পষ্ট স্মৃতি।

আর এখন সেই উপত্যকার পথিকেরা

লাল আলোয় জ্বলা জানালা দিয়ে দেখে

অদ্ভুত বিশাল ছায়াগুলো

বেসুরো সুরের সঙ্গে নড়ছে।

আর ফ্যাকাশে দরজা দিয়ে

দ্রুত, ভয়ংকর নদীর মতো

এক বিকট জনতা অনন্তকাল ধরে বেরিয়ে আসে–

তারা হাসে,

কিন্তু আর কখনও হাসিমুখে নয়।

এই কবিতার পর রডরিক একটি অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা বলেছিল। তার ধারণা ছিল, সব উদ্ভিদ ও বস্তু কোনো না কোনোভাবে অনুভব করতে পারে। তার কল্পনায় এই ধারণা আরও ভয়ংকর রূপ নিয়েছিল। সে বিশ্বাস করত, তাদের

পূর্বপুরুষের বাড়ির ধূসর পাথরগুলোও এক ধরনের চেতনা অর্জন করেছে।

তার মতে, পাথরগুলোর বিন্যাস, দেয়ালের ছত্রাক, চারপাশের পচা গাছ, এবং সবচেয়ে বড় কথা—শত শত বছর ধরে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সেই সবকিছু—মিলে বাড়িটিকে এক ধরনের জীবন্ত সত্তায় পরিণত করেছে। জলাশয়ে তার প্রতিচ্ছবিও সেই অনুভূতিকে আরও শক্তিশালী করেছে। বাড়িটির চারপাশের বাতাসও যেন ধীরে ধীরে নিজস্ব এক চরিত্র অর্জন করেছে। আর সেই অদৃশ্য প্রভাবই নাকি বহু শতাব্দী ধরে আশার পরিবারের ভাগ্যকে গড়ে তুলেছে।

রডরিকের বইগুলোর তালিকাও তার মনের মতোই অদ্ভুত ছিল। সে প্রাচীন রহস্য, ধর্মতত্ত্ব, জাদুবিদ্যা, অতিপ্রাকৃত ভ্রমণ ও মৃত্যুর আচারসংক্রান্ত নানা দুর্লভ বই পড়ত। বিশেষ করে একটি পুরোনো গথিক বই—মৃতদের জন্য গির্জার এক প্রাচীন প্রার্থনাপুস্তক—তার প্রিয় ছিল।

এক সন্ধ্যায় সে হঠাৎ জানাল, ম্যাডেলিন মারা গেছে। কিন্তু তাকে সঙ্গে সঙ্গে কবর না দিয়ে দুই

সপ্তাহের জন্য বাড়ির ভেতরের একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে রাখা হবে। তার যুক্তি ছিল—ম্যাডেলিনের রোগ অস্বাভাবিক ছিল, চিকিৎসকেরা তার দেহ নিয়ে নানা প্রশ্ন করছিল, আর পরিবারের কবরস্থানটি ছিল দূরে ও অনিরাপদ।

আমি তার এই সিদ্ধান্তে আপত্তি করিনি। তার সঙ্গে আমি নিজেই ম্যাডেলিনের দেহটি কফিনে তুলে নিয়ে নিচের ভূগর্ভস্থ কক্ষে রাখলাম।

কক্ষটি ছিল ছোট, স্যাঁতসেঁতে ও সম্পূর্ণ অন্ধকার। বহুদিন ধরে বন্ধ থাকায় ভেতরের বাতাস এত ভারী ছিল যে আমাদের মশালের আলোও ঠিকমতো জ্বলছিল না। এটি বাড়ির সেই অংশের ঠিক নিচে ছিল, যেখানে আমার শোবার ঘর। প্রাচীনকালে এটি সম্ভবত দুর্গের অন্ধকূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। পরে সেখানে বারুদ বা অন্য কোনো দাহ্য পদার্থ রাখা হতো। মেঝে ও দীর্ঘ খিলানপথের দেয়াল তামা দিয়ে আবৃত ছিল। বিশাল লোহার দরজাটি খুলতে গেলে কর্কশ ঘর্ষণের শব্দ হতো।

কফিনটি রেখে আমরা ঢাকনা সামান্য খুলে মৃতদেহটির মুখ দেখলাম। তখনই প্রথম বুঝলাম,

ভাই-বোনের মধ্যে অদ্ভুত মিল ছিল। রডরিক জানাল, তারা যমজ ছিল এবং তাদের মধ্যে এমন এক ধরনের মানসিক যোগাযোগ ছিল, যার প্রকৃতি সে নিজেও ব্যাখ্যা করতে পারত না।

মৃত ম্যাডেলিনের মুখে তখনও সামান্য রক্তিম আভা ছিল, ঠোঁটে ছিল এমন এক ক্ষীণ হাসি, যা মৃত মানুষের মুখে দেখা গেলে ভয়ংকর মনে হয়। আমরা দ্রুত কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে লোহার দরজা আটকে ওপরের ঘরে ফিরে এলাম।

এরপর কয়েকদিন রডরিকের মধ্যে আরও ভয়ংকর পরিবর্তন দেখা দিল। তার স্বাভাবিক আচরণ পুরোপুরি হারিয়ে গেল। সে কোনো কাজ করত না। উদ্দেশ্যহীনভাবে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরে বেড়াত। তার মুখ আরও ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, চোখের পুরোনো দীপ্তি নিভে গেল। কথা বলার সময় তার কণ্ঠে সবসময় ভয় মিশে থাকত।

মাঝে মাঝে মনে হতো সে যেন কোনো ভয়ংকর গোপন কথা বলতে চাইছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। আবার কখনও তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখতাম, যেন কোনো অদৃশ্য শব্দ শুনছে। তার এই অবস্থা আমাকেও প্রভাবিত করতে শুরু করল। তার কুসংস্কারগুলো ধীরে ধীরে আমার মনেও জায়গা করে নিচ্ছিল।

ম্যাডেলিনকে ভূগর্ভস্থ কক্ষে রাখার সাত বা আট দিন পর এক রাতে আমি শুতে গেলাম, কিন্তু ঘুম এল না। ঝড় উঠেছিল। জানালার পর্দা বাতাসে দুলছিল, ঘরের অন্ধকার আসবাব ও ছেঁড়া কাপড়গুলোকে আরও ভয়ংকর করে তুলেছিল। হঠাৎ অকারণ আতঙ্ক আমার বুকের ওপর চেপে বসল।

আমি উঠে পোশাক পরলাম এবং ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর পাশের সিঁড়ি থেকে হালকা পায়ের শব্দ শুনলাম। বুঝলাম রডরিক আসছে।

সে হাতে একটি বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার মুখ আগের মতোই মৃতের মতো ফ্যাকাশে, কিন্তু চোখে ছিল অদ্ভুত উন্মত্ত আনন্দ। তার উপস্থিতি আমাকে ভয় পাইয়ে দিলেও একাকিত্বের চেয়ে তাকে কাছে পাওয়া স্বস্তিকর মনে হলো।

“তুমি কি এটা দেখোনি?” সে হঠাৎ বলল। “তাহলে দেখো।”

সে জানালা খুলে দিল। ঝড়ের প্রচণ্ড বাতাস আমাদের প্রায় ফেলে দিচ্ছিল। রাতটি ছিল ভয়ংকর, অথচ অদ্ভুত সুন্দর। মেঘগুলো এত নিচে নেমে এসেছিল যে মনে হচ্ছিল বাড়ির মিনারগুলোকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। বাতাসের ঘূর্ণিতে মেঘগুলো চারদিক থেকে একে অপরের দিকে ছুটে আসছিল। চাঁদ বা তারা দেখা যাচ্ছিল না, বজ্রপাতও হচ্ছিল না। কিন্তু মেঘের নিচে এবং বাড়ির চারপাশে এক অস্বাভাবিক আলোকিত কুয়াশা ছড়িয়ে ছিল।

আমি রডরিককে জানালা থেকে সরিয়ে আনলাম। বললাম, এগুলো হয়তো বৈদ্যুতিক প্রকৃতির স্বাভাবিক ঘটনা, অথবা জলাশয়ের বিষাক্ত বাষ্পের ফল। জানালা বন্ধ করে আমি একটি পুরোনো বই তুলে নিলাম। বললাম, এই ভয়ংকর রাতটি আমরা গল্প পড়ে কাটাব।

বইটির নাম ছিল “ম্যাড ট্রিস্ট” । বইটি রডরিকের প্রিয়—এ কথা আমি কিছুটা রসিকতা

করেই বলেছিলাম। তবু আশা করেছিলাম গল্পটি তার উত্তেজিত মনকে অন্যদিকে সরিয়ে দেবে।

গল্পে তখন বীর এথেলরেড এক সন্ন্যাসীর বাড়িতে জোর করে ঢোকার চেষ্টা করছে। দরজা ভাঙার বর্ণনা পড়তে গিয়ে আমি থেমে গেলাম। মনে হলো বাড়ির দূরবর্তী কোথাও ঠিক একই ধরনের কাঠ ভাঙার শব্দ শুনলাম। নিজেকে বোঝালাম—এটা নিশ্চয়ই কাকতালীয়।

আমি আবার পড়তে শুরু করলাম। গল্পে এথেলরেড এক ভয়ংকর ড্রাগনের মুখোমুখি হলো। সে ড্রাগনকে আঘাত করল এবং ড্রাগন এমন এক ভয়ংকর চিৎকার করল যে এথেলরেড কান ঢেকে ফেলতে বাধ্য হলো।

ঠিক তখনই আমি আবার থেমে গেলাম। এবার কোনো সন্দেহ ছিল না—দূর কোথাও থেকে আমি সত্যিই এক দীর্ঘ, কর্কশ ও অস্বাভাবিক চিৎকার শুনেছি। শব্দটি ছিল গল্পে বর্ণিত ড্রাগনের চিৎকারের অবিকল প্রতিরূপ।

আমি রডরিকের দিকে তাকালাম। সে চেয়ারের অবস্থান বদলে দরজার দিকে মুখ করে বসেছিল। তার ঠোঁট কাঁপছিল, যেন সে নিঃশব্দে

কিছু বলছে। মাথা নিচু, চোখ বিস্ফারিত। সে ধীরে ধীরে সামনে-পেছনে দুলছিল।

আমি গল্প পড়া চালিয়ে গেলাম। গল্পে এথেলরেড ড্রাগনকে পরাজিত করে একটি বিশাল ঢাল নিতে এগিয়ে যায়। ঢালটি দেয়াল থেকে পড়ে রুপালি মেঝেতে ভয়ংকর ধাতব শব্দ সৃষ্টি করে।

আমি সেই বাক্য শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কোথাও থেকে ঠিক তেমনই একটি ভারী, ধাতব, চাপা শব্দ শুনলাম—যেন সত্যিই কোনো বিশাল ঢাল রুপার মেঝেতে পড়ে গেছে।

আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং রডরিকের কাছে ছুটে গেলাম। তার চোখ সামনে স্থির, মুখ পাথরের মতো শক্ত। কাঁধে হাত রাখতেই তার শরীর কেঁপে উঠল। ঠোঁটে এক অসুস্থ হাসি ফুটল। তারপর সে দ্রুত, নিচু ও অস্পষ্ট কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল।

“তুমি শুনতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ, আমি শুনছি। অনেক দিন ধরে শুনছি। অনেক মিনিট, অনেক ঘণ্টা, অনেক দিন ধরে! কিন্তু আমি বলতে সাহস করিনি। হায়, আমাকে দয়া করো! আমি বলতে পারিনি!”

তার কণ্ঠ কাঁপছিল।

"আমরা তাকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দিয়েছি! আমি কি বলিনি যে আমার ইন্দ্রিয়গুলো কত তীক্ষ্ণ? আমি তার কফিনের ভেতরে প্রথম নড়াচড়া শুনেছিলাম। বহু দিন আগে শুনেছিলাম। কিন্তু আমি সাহস করিনি–সাহস করিনি বলতে!"

তারপর সে প্রায় উন্মাদ হয়ে চিৎকার করল–

"আজ রাতে এথেলরেডের দরজা ভাঙা, ড্রাগনের মৃত্যু চিৎকার, ঢালের ধাতব শব্দ–এসব কিছুই কেবল গল্পের শব্দ নয়! এগুলো তার কফিন ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ, লোহার কবজা ঘষে ওঠার শব্দ, আর সেই তামায় মোড়া ভূগর্ভস্থ কক্ষে তার লড়াইয়ের শব্দ!"

সে আতঙ্কে চারদিকে তাকাল।

"আমি কোথায় পালাব? সে কি এখনই এখানে আসবে না? সে কি আমার তাড়াহুড়োর জন্য আমাকে দোষ দেবে না? আমি কি তার পায়ের শব্দ সিঁড়িতে শুনছি না? আমি কি তার হৃদয়ের সেই ভারী, ভয়ংকর শব্দ শুনতে পাচ্ছি না?"

হঠাৎ সে পাগলের মতো উঠে দাঁড়াল।

“পাগল! আমি বলছি–সে এখন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে!”

তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল পুরোনো দরজার পাট দুটি ধীরে ধীরে খুলে গেল। ঝড়ের বাতাসে দরজা খুলেছিল–কিন্তু তার ওপারে সত্যিই দাঁড়িয়ে ছিল ম্যাডেলিন আশার!

তার সাদা পোশাকে রক্তের দাগ ছিল। শরীরের সর্বত্র ছিল ভয়ংকর লড়াইয়ের চিহ্ন। কিছুক্ষণ সে দরজার কাছে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটি নিচু গোঙানির সঙ্গে ভেতরে পড়ে গেল এবং তার ভাই রডরিকের ওপর আছড়ে পড়ল। তার শেষ মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেই সে ভাইকে মাটিতে ফেলে দিল।

রডরিক আশারও মৃত হয়ে গেল।

আমি সেই ঘর থেকে, সেই বাড়ি থেকে আতঙ্কে পালিয়ে বেরিয়ে এলাম। বাইরে তখনও ভয়ংকর ঝড় চলছে। পুরোনো সেতু পেরিয়ে আমি যখন দূরে যাচ্ছি, হঠাৎ পথের ওপর অদ্ভুত এক লাল আলো পড়ল।

আমি ঘুরে তাকালাম।

রক্তলাল পূর্ণ চাঁদ তখন ঠিক বাড়িটির পেছন থেকে উঠে এসেছে। তার আলো সেই সূক্ষ্ম ফাটলের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করছিল, যে ফাটলটি ছাদ থেকে আঁকাবাঁকা পথে নিচে নেমে এসেছিল।

আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ফাটলটি দ্রুত প্রশস্ত হতে লাগল। ঘূর্ণিঝড়ের এক প্রচণ্ড ঝাপটা এল। মুহূর্তের মধ্যে ফাটল পুরো দেয়ালজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর আশার বাড়ির বিশাল দেয়াল দুদিকে ফেটে গিয়ে ভেঙে পড়তে শুরু করল।

এক দীর্ঘ, প্রচণ্ড, গর্জনময় শব্দ উঠল—যেন একসঙ্গে হাজার নদীর জলধারা ছুটে চলেছে।

আর আমার পায়ের কাছে থাকা সেই গভীর, অন্ধকার জলাশয় ধীরে ধীরে, নিস্তব্ধভাবে নিজের ভেতর পুরো "আশারদের বাড়ি" -র ধ্বংসাবশেষকে গিলে নিল।

এবং সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল আশার বংশের শেষ অধ্যায়।